রচনা আরম্ভের শতবর্ষ

ইছামতীর অতিথি

বিভূতিভূষণ হয়ে ওঠার কাহিনি

১৯১৭ - ১৯২৯

সায়ন্তন ঠাকুর

ICCHAMOTIR ATITHI
A Bengali Novel
By Sayantan Thakur

First Published
September, 2026

ISBN 978-81-7332-462-8

Price ₹ 400

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০২৬

প্রচ্ছদ: সুপ্রসন্ন কুণ্ডু
পথের পাঁচালী ১০০-এর লোগো: দেবজিৎ রায়

দাম ₹ ৪০০

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা -৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়
যিনি ভালোবেসেছিলেন দরিদ্র সহায় সম্বলহীন গ্রাম্য এক যুবককে
স্বামীর দেওয়া একটি মাত্র কালোপেড়ে শাড়ি সম্বল করে যিনি রওনা দিয়েছিলেন
চিতাগ্নির ধূমাচ্ছন্ন অজানা পথে
যুগন্ধর কথাকারের খ্যাতি যিনি প্রত্যক্ষ করেননি কখনও
কখনও যিনি বিভূতিকে ছেড়ে দূরেও চলে যাননি...

কৈফিয়ৎ

‘ইছামতীর অতিথি’ প্রকৃত প্রস্তাবে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, কোনও প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ নয়। পিতৃহীন অসহায় দরিদ্র বাঙালি যুবক, তার অকালমৃতা যুবতি স্ত্রী আর পরমা প্রকৃতি এই উপন্যাসের কুশীলব। উত্তরকালে যে যুবক কালোত্তীর্ণ যুগন্ধর সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত হবেন, যাঁর লেখা স্বকীয়তার জোরে বাংলা সাহিত্যের চিরাচরিত পথকে আমূল বদলে দেবে। আর সেই যুবতি দীপ্তিময় মঞ্চে পর্দার আড়ালে রয়ে যাবেন চিরকাল। ওই যুবক প্রতিটি বাঙালির বিশেষ পরিচিত, আপনার জন; যাঁর লেখার সঙ্গে আমাদের প্রায় সবার প্রথম পরিচয় ঘটে অমলিন কৈশোরে বিদ্যালয়ে পাঠ্য-পুস্তকের পাতায়। সেই রচনায় আমাদের হাত ধরে এক আশ্চর্য জগতে নিয়ে যায় দূর পল্লীগ্রামের একজন দরিদ্র বালক, নিরন্তর আকাশকুসুম কল্পনা করা তার কথক বাবা, কোনওক্রমে ক্ষুদ-কুঁড়ো সম্বল করে সংসার আগলে রাখা লাবণ্যময়ী মা আর উচ্ছ্বলা কিশোরী দিদি, ভাইয়ের সঙ্গে যার সম্পর্ক বস্তুত অকালে মারা যাওয়ার পরেও কখনও ফুরিয়ে যায় না। সেই গাঁয়ের নাম নিশ্চিন্দিপুর আর ওই বালকের নাম সকলেই জানেন!

এরকম একজন প্রতিভাবান শিল্পীর জীবন অবলম্বন করে উপন্যাস লেখার বিপদ নানাবিধ, ইদানীং অধিকাংশ বাঙালি পাঠক-পাঠিকার একটি বিপজ্জনক প্রবণতা সেই বিপদের মধ্যে প্রধানতম। খেয়াল করে দেখেছি তাঁরা উপন্যাসকে ইতিহাস আর ইতিহাসকে কাল্পনিক উপন্যাস হিসাবে দেখেন! মানতে অথবা বিশ্বাস করতে চান না ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনাকে অবলম্বন করে উপন্যাসই লিখছেন, কোনও নথি নির্ভর কীটদ্রষ্ট

জীর্ণ ইতিহাসের পুথি নয়! ফলে বিস্তর গোল বাঁধে, তাঁরা দাবী করেন, 'এই যে সংলাপ লিখেছেন, কই দেখান দেখি এরকম কথা অমুক চরিত্র কোথায় বলেছিলেন?' অথবা 'এমন ঘটনা তো ঘটেইনি, জীবনীতে তো পাইনি! গালগল্প লিখেছেন নাকি?', অবশ্য এমন সুললিত ভাষায় বলেন না, প্রাকৃতজনের ভাষাই তখন বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে তাঁদের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে, আজকের অবিশিষ্ট ভাষায় সমাজমাধ্যমে এই আলোচনা চক্রকে অনেকেই 'খাপ পঞ্চায়েত' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন।

এই ধরণের পাঠকরা ভুলে যান 'ইনিগ্লোরিয়াস বাস্টার্ডস' নামক একটি অতিখ্যাত চলচ্চিত্রের কথা, সেখানে ইতিহাসকে অনেকটাই রদবদল করে নিয়েছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার কোয়েন্টিন ট্যারেন্টিনো। আমাদের পাঠকরা 'গেল গেল' রব তুলতেন নিঃসন্দেহে, তাঁরা যেন অনেকটা বিধবা শুচিবায়গ্রস্ত সেকেল পিসিমার মতন! শিল্পে এইধরণের বদলকেই বলা হয় 'বিকল্প সম্ভাবনার ইতিহাস' এবং এটিকে সৃজনশীল কৌশল হিসাবে বুদ্ধিমান স্রষ্টা ব্যবহার করতেই পারেন।

যাইহোক, ধান ভানতে এই শিবের গীতটুকু এখানে জরুরী ছিল। এবার আসি কাহিনির বিষয়ে, কয়েকটা কথা বলাও উচিত।

এই রচনার সময়কাল ইংরাজি উনিশশো সতেরো-আঠারো থেকে উনিশশো উনত্রিশ সালের দোসরা এপ্রিল, অর্থাৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বিবাহের সময় থেকে পথের পাঁচালী উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ অবধি উপন্যাস বিস্তৃত হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, এই অত্যন্ত জরুরী কালপর্ব উত্তরকালে বিভূতিভূষণ নামক এক দানবীয় প্রতিভাকে তৈরি করেছে। এই পর্বেই তাঁর জীবন একের পর এক শোকের আঘাতে অবশ হয়ে এসেছে, অপরিসীম দারিদ্রের সঙ্গে ছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত কৃষ্ণকায় ভবিষ্যৎ অথবা বলা ভালো ভবিষ্যৎ বলেই কিছুই ছিল না। ওই রকম কৃষ্ণগহ্বর থেকে কোনও রকম আলোর বিন্দুও দেখা সম্ভব নয়। ইস্কুলে চাকরি পেয়েছেন কিন্তু মিথ্যা অপবাদে সেই চাকরি চলে যাচ্ছে, মা-স্ত্রী-বোন একের পর এক প্রিয়জন অকালে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তাঁকে, এই সেই সময় যখন একজন সাধারণ মানুষ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু তিনি কোনও সাধারণ মানুষ নন। তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি প্রায় একা হাতে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা বদলে দিতে পারেন।

তাই এই কাহিনি সেই হার-না-মানা জিদের, প্রতিকূল পরিবেশে লড়াই করে ঘুরে দাঁড়ানো একজন শিল্পীর, ভাগ্যের হাতে পরাজিত হয়েও যিনি ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেন। এই কাহিনি অশ্রু, বেদনা, নিঃসঙ্গতা, আনন্দ ও প্রেমের! এখনও আমার বঙ্গদেশে যখন কোনও শিল্পী অপমান লাঞ্ছনা ক্লান্তি ও বিষাদের গহিন আঁধারে পথ হারিয়ে ডুবে যেতে থাকেন তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই মহাজীবনের আখ্যান তাঁকে হাত বাড়িয়ে বলবে, 'ভয় কী, শিল্পের পথ অনিশ্চয়তার, উঠে এসো, নিজেকে বিশ্বাস করো!'

ঠিক এই কারণেই আমি বিভূতিভূষণের জীবনের এই পর্বটুকু উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নিয়েছি, এর পরের অংশে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ তাঁর বঙ্গজোড়া খ্যাতি উপভোগ করবেন, কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর জলচল নাই! আমার প্রিয় অখ্যাত যুবক বিভূতি, অকালমৃতা স্ত্রী গৌরীই তখন তার চালিকাশক্তি। আমি প্রদীপের আলোর আখ্যান ছেড়ে তাই রওনা দিয়েছি সলতে পাকানোর দিনগুলির দিকে, ওখানেই ঠিক ঠিক চেনা যায় বিভূতিভূষণ ও তাঁর সাহিত্যকে!

বিভূতিভূষণ প্রথমা স্ত্রী মারা যাওয়ার পর পরলোকতত্ত্বে অসম্ভব আগ্রহী হয়ে ওঠেন, ব্যক্তি জীবনে পরলোকচর্চার বিষয়ে তাঁর অতি গভীর বিশ্বাস ছিল। এই উপন্যাসে আমি সেই দিকটি বিশেষ ভাবে ব্যবহার করেছি, অবিশ্বাসী পাঠক এটিকে গালগল্প বলে উড়িয়ে দিতেই পারেন কিন্তু তাতে শিল্পের রস হানি হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করি, এই কাহিনির বিভূতিভূষণ নদী জল আকাশ দিগন্তবিথারি প্রান্তর ঘেঁটু-কালকাসুন্দে-বনসিম-কন্টিকারি ঝোপ চাঁপা-ছাতিম ইত্যকার কুসুমদের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলেন। এমনকি একটি কলমও তাঁর কাছে প্রাণময় সত্তা। এরা সবাই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়জন। এটিকে আমার অলস কল্পনা ভাবলে ভুল হবে, ব্যক্তিগত দিনলিপির পাতায় এর অসংখ্য উদাহরণ আমি পেয়েছি, তাছাড়াও বিভূতিভূষণ চৈতন্য সত্তার কথা তাঁর লেখায় বারংবার বলেছেন। এই সমস্ত কিছুর উপর নির্ভর করেই আমি এটিকে শৈল্পিক কৌশল হিসাবে বিভূতির মন-জগত উন্মোচনের জন্য ব্যবহার করেছি।

এই উপন্যাসে ব্যবহৃত চিঠিপত্র, কোটেশন, বিভূতিভূষণের লেখার অংশ হুবহু এক রাখা হয়েছে, ঘটনার ক্ষেত্রেও আমি একনিষ্ঠ থেকেছি, প্রধান

চরিত্ররা সবাই ঐতিহাসিক, সেখানেও কিছু মাত্র অদল বদল করা হয়নি। শুধু ব্যক্তি বিভূতি, তাঁর মন-আকাশ, চিন্তা-ভাবনা ও বাকি চরিত্রদের সংলাপ আমি তথ্য ও প্রমাণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিজের কল্পনার সাহায্যে তৈরি করেছি, এটিই আমার স্বাধীনতা। কারণ আমি রচনা করেছি আমার ব্যক্তিগত বিভূতিকে, তাঁর সঙ্গেই আমার গত চার বছর ধরে পিরিত, প্রতিদিন কথা হয়েছে, তিনি উত্তর দিয়েছেন আমার প্রশ্নের, আমিও তাঁকে চেনার চেষ্টা করেছি! আমাদের দুজনের সেই ব্যক্তিগত প্রণয়ের কারণেই রচিত হয়েছে ইছামতীর অতিথি, সঙ্গী ছিলেন আরেকজন ছায়াবৃতা, তাঁর নাম গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই লেখা শুরু করেছিলাম দু'হাজার বাইশ সালের হেমন্তে, আজ প্রায় চার বছর পর দু'হাজার ছাব্বিশে এক ম্রিয়মান আষাঢ়ে শেষ হল। আর ক'দিন পরেই শ্রাবণ, বিভূতি-গৌরীর বিয়েও হয়েছিল ওই শ্রাবণে আর নিতান্ত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে গৌরী এই জগত ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সেই হেমন্তেই! কী অদ্ভুত সমাপতন, তাই না? আমি কিন্তু একে এখন আর সমাপতন বলে মনে করি না, এইটি আমার কাছে সেই অঘটনঘটনপটিয়সী চির-রহস্যময়ীর ইশারা!

রচনার সময় যে সমস্ত বইপত্রের সাহায্য নিয়েছি তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা আগ্রহী পাঠকদের জন্য পরিশিষ্টে দেওয়া রইল।

তবে অনেক ক্ষেত্রেই বিভূতি জীবনীকারদের মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা নিয়ে মতবিরোধ দেখা গেছে, আমি সেক্ষেত্রে সকল মতামত পড়ে আমার বোধবুদ্ধি অনুযায়ী একটি ঘটনাকে তুলে এনেছি। এই নিয়ে অনেক মজার তথ্যও রয়েছে আমার কাছে, পরে কখনও আপনাদের বলব নিশ্চয়!

অলমিতি

সায়ন্তন ঠাকুর

আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ।

১

চৈত্র মাসের সন্ধ্যা এই নিঝুম বনপাহাড়ে নিজের আঁচলখানি যেন আলগোছে বিছিয়ে রেখেছে। পাহাড় অবশ্য নামেই, আসলে দিগন্তবিথারি মালভূমির আলপনা, সেই পুবদিকে লবটুলিয়া-নাড়া-বইহার থেকে পশ্চিমে মুঙ্গের সীমান্ত আর ওদিকে কিষেণপুর হয়ে উত্তরে আজমবাদ অবধি নিবিড় অরণ্যকে ছায়া সঙ্গিনী করে উদাসী মধুমাসের মতোই সে বয়ে গেছে। চলার পথের মাঝে রয়েছে নির্জন মকাই-জনাই ক্ষেত, চিনাঘাসের ঝোপ, ঠিক যেন দীর্ঘ বাক্যের মাঝে বিরামচিহ্ন, আর রয়েছে মানুষের ঘর-গেরস্থালি, পাতা দিয়ে ছাওয়া একটেরে ঘর, সাঁওতালদের জাহের বুড়ির থান, পরবের দিনে ধামসা-মাদলে উতলা বাতাস মহুয়া-শাল-কুসুম গাছের মধ্য দিয়ে যখন ভেসে যায়, তখন মনে হয় এই আশ্চর্য একাকী সৌন্দর্যের মাঝে আজও তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ। তোমার পরনে সেই কালো শাড়িখানি, মুখে পানিতরে দিঘির ঘাটে এক পলক দেখা আলতো হাসি, এখনও ঠিক তেমনই বালিকা, তেমনই ছেলেমানুষি অভিমান... অথচ কত বছর হয়ে গেল, আজ বিশে মার্চ উনিশশো চব্বিশ, মানে ছয় ছয়টি বছর মাথার উপর দিয়ে চলে গেল... তুমি অবিকল একই হয়ে রয়ে গেলে গৌরী!

কাছারি বাড়ির মাটির দাওয়ায় বসে ন্যাড়া পোড়ার জগত ভাসানো ছমছমে অরণ্য-জোসনার দিকে তাকিয়ে বিভূতি নিজেকেই অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি সত্যিই আমাকে ছেড়ে চলে গেচ? তাই যদি হবে, তাহলে সেদিন এসে স্পষ্ট ভাষায় কেন বললে যে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষায় রইচি? কোন্‌টি সত্য গৌরী? এই জঙ্গল-মাহাল, সিদ্ধেশ্বরবাবুদের পঞ্চাশ টাকা মাস-মাইনের চাকরি করা ম্যানেজার আমি, আমার এই খোড়ো চালের

মাটির কাছারি বাড়ি, একার গেরস্তালি, সত্য কি এই? নাকি যে জগতে তুমি রয়েচ, যেখানকার কতা আমরা কিচু জানিনে, কল্পনাও করতে পারিনে, অস্পষ্ট হেমন্ত-কুয়াশার মতন, ছাতিম ফুলের সুবাসের মতন যা আচ্ছন্ন করে আমাদের যুক্তিভুবন... সেইটে সত্য? বুঝতে পারিনে ভালো, আর তাই হয়তো এমন জোসনা সন্ধে হলেই তোমার কথা মনে ভেসে আসে। মনে পড়ে ছাতিমের কথা, সেই তোমার চলে যাওয়ার দিনে পানিতরে তোমার ঘরের জানলা পাশের গাছটি থেকে উপচে পড়েছিল ওই ফুল...

'ম্যান্‌জারবাবু, আপকা তবিয়ত ঠিক হ্যে না?', সেরেস্তার বৃদ্ধ কর্মচারী আসরফির কথায় সংবিত ফিরল বিভূতির। অতীত স্মৃতির গহিন অতল থেকে মুখ তুলে একচিলতে হাসি ঠোঁটে টেনে এনে আসরফির পানে চেয়ে বলল, 'কাল হোলির দিনে আপনাদের খুব আসর জমবে, কী বলেন!'

হাতের নিভু লণ্ঠনটি দাওয়ার একপাশে রেখে মৃদু হাসলেন বৃদ্ধ, 'ও তো হোগা বাবুজী! দূর দূর সে লোগ ভি আয়েগা, সারদাবাবু নে ভাগলপুর সে লাড্ডু ঔর নমকিন লায়েঙ্গে, থোড়া বহুত নাচা-গানা ভি হোগা!'

'ভাগলপুরের বড়োবাসা থেকে কাল সারদাবাবু এখানে আসবেন নাকি?'

সন্ধ্যা রাত্রির জ্যোৎস্না নিঃসঙ্গ যুবতির মতন এখন দূরে শৈলরাজির মাথায় বিশ্রামরতা, মালভূমির সানুদেশে নিথর বনভূমি সেই জ্যোৎস্নার সামান্য স্পর্শে আরও রহস্যময়ী, যেন বনদেবী স্বয়ং নিজ হাতে আজ রাত্রে তাঁর অভিসারের আয়োজন সম্পূর্ণ করেছেন। সেই মায়াবৃত বনপাহাড়ের দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত পর বৃদ্ধ আসরফি নিচু গলায় বললেন, 'হাঁ, আয়েঙ্গে। লেকিন আজ সামমে আপ আকেলে বাহার মাত যাইয়ে বাবুজী!'

লণ্ঠনের মৃতপ্রায় আলোয় আসরফি টিন্ডেলের মুখের বলিরেখাদের কোনও প্রাচীন কীংবদন্তীর মতন দেখাচ্ছে, একপলক মুখের দিকে তাকিয়ে বিভুতি কিছুটা অবাক হয়েই শুধোল, 'কেন বলুন তো?'

আসলে গত কয়েকদিন হল ঘোড়ায় চড়া শিখেছে বিভূতি, সেই বাহনকে নিয়ে প্রায়দিনই বিকেল গড়িয়ে বনজঙ্গলের অচেনা সুঁড়িপথে ঘুরে বেড়ায়। পথের দুপাশে বুনোফুল, জংলা লতা, শাল মহুয়ার শুকনো পাতায় সাজানো বনপথ তার সঙ্গে প্রেয়সীর মতন ইশারায় কথা কয়, সেই অলীক সংলাপে মিশে যায় কত নাম-না-জানা পাখির ডাক, কোটরা হরিণের ভীতু চিৎকার,